আমার এই দেহটা একটি গাড়ী। আমি কি এই গরুর গাড়ীতে চড়ে কোথাও চলছি? যেমন, হতে পারে, আমার ছেলেবেলায় চলেছি? যাই হোক হঠাৎ আমার মনে হলো আমার এই দেহটা একটা গাড়ি। গরুর গাড়ি। ফসলকাটা বা ফসলহীন শূন্য শুকনো একখানা অনন্ত মাঠে একখানা গরুর গাড়ী। মাঠের ওপর অসংখ্য দিকের একটা দিক ধরে মন্থর গতিতে এগিয়ে যাওয়া বা পিছিয়ে যাওয়া গরুর গাড়ি। দিকগুলো মাঠের ওপর জট জাকিয়ে গেছে তাই গাড়ীটা আগাচ্ছে না পেছাচ্ছে বোঝা যাচ্ছেনা সামনে হয় সূর্যাস্ত হচ্ছে কিংবা চাঁদ উঠছে, অস্তায়মান সূর্যে আর উদীয়মান চাঁদে কোনো পার্থক্য করা যাচ্ছে না। কেননা ওটা দিগন্তের ওপরে থমকে দাঁড়িয়ে আছে। গোল ললাচে পূর্ণ ভরাট। ক্রমশঃ উঠলে বোঝা যেত এটা চাঁদ- কেননা আমার পিছনে যে আকাশ সেই আকাশটা ধোঁয়াটে, সন্ধ্যা সন্ধ্যা ভাব, সকাল হলে আমার শরীরটাই বলে দিতো আর ক্রমশঃ নেমে হারিয়ে গেলে বোঝা যেত এটা সূর্য। সূর্য হলে আস্তে আস্তে আস্তে তার নিচেকার কানাটা ক্ষয়ে ক্ষয়ে ক্ষয়ে যেতো আর শেষে ঐ সামনের আকাশটাও ধোঁয়াটে হয়ে যেতো। চাঁদ হলে ধীরে ধীরে উঠতো, তার তাতা ললিটা ধীরে ধীরে রূপার রঙে বদলে যেতো রপ একটা শব্দহীন স্পর্শহীন বর্ষার ধারার মতো জ্যোৎস্না উঠতো।

না, এ সূর্যও নয়, চাঁদও নয়। তাছাড়া এমাঠে দিক নেই। ওটা পূর্ব দিকে হলে জানতাম-এই সন্ধ্যা সন্ধ্যা ভাবটার নিরিখে জানতাম- ওটা চাঁদ আর পশ্চিমে হলে এই সন্ধ্যা সন্ধ্যা ভাবটাকে বিচার করে মানতাম ওটা সূর্য। কিন্তু এমাঠে, আবার বলছি, দিক নাই।

অমনি একটা মাঠে চলেছে বা দাঁড়িয়ে আছে চলবে বলে একখানা গরুর গাড়ি। চাকার গতিটাকে গুটিয়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিংবা হয়তো চলেছে। চাকার লাটাই থেকে গতিটা খুলে খুলে যাচ্ছে। কিন্তু এ গাড়িতে কোনো গাড়োয়ান নাই। একটা ভূতুড়ে গাড়ি। শুধু যে গাড়িটায় গাড়োয়ান নাই তাই নয়, গাড়িটায় বুঝি সওয়ারিও নাই। একটা গাড়োয়ানহীন, সওয়ারিহীন গরুর গাড়ি। অনন্ত শূন্য একটা মাঠে, একটা না চাঁদ না সূর্য গোলাকার আকাশের চোখের দিকে লক্ষ্য করে এগোচ্ছে কিংবা পিছোচ্ছে।

ভেবেছিলাম ওই গাড়িটা কোথাও পৌঁছে যাবে। কোথায় পৌঁছবে? গাড়ি থেকে তা কোনেদিনই জানতামনা, এখানো জানিনা। ভাবতাম চলতে চলতে কোথাও না কোথাও পৌঁছে যাবে। এই ‘কোথাওটা যে কোথায়, কোনস্থানে কোনকালে বা এটা স্থানকালের বাইরে একটা ‘কোথাও’ তা জানতামনা, এখানো জানিনা। আজ আমার সন্দেহ হয়েছে আসলে যাকে আমি চলা ভেবেছিলাম সেটা

চলা কিনা। আমি হয়তো এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গঁজ তুলিছি আর সেই গাঁজের নেশায় ভেবেছি আমি চলছি। আজ এই শেষ অধ্যায়ে পৌঁছে দেখছি আমি একটা জনশূন্য গ্রামশূন্য মাঠে না সূর্য না চন্দ্র নক্ষত্রের মুখোমুখি চালকহীন গাড়ি হয়ে দাঁড়িয়ে আছি।

কিন্তু আমার মধ্যে একটা কিছু আছে যেটা ছুটতে জানে- যেটা দিকবেদিক ছুটে যাচ্ছে- নানারঙের আলোয় যে লুটোপুটি খেয়েছে, কালের দরজায় যেন কোনো সুরঙ্গের মুখের পর্দাটাকে নিমেষর জন্য সাঁৎ করে সরিয়ে দিয়েছে। কী দেখেছে জানিনা কিন্তু ময়ূর পুচ্ছের মতো ছড়ানো ময়ূর পুচ্ছের মতো কী একটাকে দেখে বিহ্বল হয়ে গেছে। কখনো বা স্থানটাকে কালটাকে ফুঁদিয়ে উড়িয়ে দিয়ে শূন্যে দোল খেয়েছে।

এটা কি চলা নয়? তার মানে কি আমি এই যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চলেছি-দেহটা মেট বলিময়ের আগে নিমেষে নিমেষে কোষে কোষে গাঁজ তুলেছে- স্টীম তৈরি হয়েছে। অদৃশ্য রেলের ওপর হুড়মুড় করে চলেছি, মাঝে মাঝে প্রাণপনে দুঃখসুখের হুইসেল বাজিয়েছি কিন্তু-এখন যেন মনে হচ্ছে চাপাঠেলা পিসটনটা-তেল চকচকে পিষ্টনটা ভীষণ দ্রুত গতিতে সামনে পিছনে নেচেছে আর নেচেছে, চাকাগুলো এতজোরে ঘুরেছে যে দেখে মনে হয়েছে তারা কোনো শক্ত বস্তু দিয়ে তৈরিঃ পিন্ড আসলে ঐ খন্ড। গাড়ী চলেনি কিন্তু ভেতরে ময়ূরের মতো সেটা পেখম তুলে নেচেছে, নেচেছে, নেচেছে....

কী জানি কেন আমার চোখে বিশ্ব নিখিলের সব কিছু আকাশের চাঁদতারা সূর্য, মাটির ওপর টলমল জল। বহু বিচিত্র গাছপালা, সব কিছু কেমন যেন ময়ূর ময়ূর মনে হয়। গতরাত্রে স্বপ্নে দেখলাম আমি কী একটা কোথায় বাজাচ্ছি বা কিছু একটা আপনা থেকেই বাজছে, শাঁখও নয় ডমরুও নয়, কেমন মেঘ মেঘ শব্দ-আর সেই শব্দে সামনে দিয়ে পেখম তুলে একটা ময়ূর চলে গেল, তার ছড়ানো পেখম আমার গায়ে আশ্চর্য একটা রেশম রেশম অনুভূতি ছড়িয়ে দিলো।

স্বপ্ন দেখার পর ঘুম ভাঙলে চেয়ে দেখি আমার সামনে মেঝে থেকে প্রায় এক মানুষ ওপরে একটা ছোট্ট চৌকো জানালা, একধরনের গবাক্ষ-আমার এই ঘরটার চোখ। সেই জানালাটায় গোটাকয়েক ওপর নিচে দাঁড়ানো সরল সরল শিক শিকগুলোর ওপাশে এদের গা ঘেঁষে ছোট্ট একটা গাছের শাখা- শিশু অশ্বথের একটা শাখা। এই ঢোঁড়া সাপের মতো শেকড়টা জানলার চৌকাঠটাকে পেঁচিয়ে দেওয়ালের একটা ফাটলে ঢুকে পড়েছে। আর এই জানলার ফ্রেমে একটা গোলগোল চাঁদ

মাখনের চাঙ্ যেমন গলতে থাকলে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে তেমনি এই মাখন আলোর চাঁদটা গলে পড়ছে চারদিকে। শিকগুলো কালো ছায়ার মত। সহসা মনে হল এই চৌকো জানালায় যে দৃশ্যের টুকরোটা আঁকা হয়ে রয়েছে সেই টুকরো দৃশ্যটা আমার সদ্য স্বপ্নে দেখা ময়ূরের একটা খালের মাথায় নীল নীল সবুজ সবুজ সোনালী সোনালী চোখ। মনে হলো সেই ময়ূরটা আমারে পেখম দিয়ে ঘিরে ফেলেছে।

সদ্য স্বপ্ন দেখার কথা বললাম। আসলে আমি ঘুমিয়ে ছিলাম না জেগে ছিলাম ঠিক জানিনা। আমি যেন সব সময় ঘুম আর জাগরণের মাঝখানের যে দেউড়িটা সেই দেউড়িটায় সব সময় ইতস্ততঃ করি, কোনদিকে পা বাড়াবো জানিনা।

আমি এখানে যার পোয়িং গেষ্ট হয়ে আছি সেই বুড়ি বলে আমি নাকি ঘুমুইনা; সারারাত জেগে কাটাই। বুড়ি কোনো কোনো দিন, হয়তো ভোর-রাত্তিরে, বন্ধ দরজার ও পাশ থেকে খুট খুট করে কড়া নাড়ে। গভীর রাত্তিরে সে এমন খুট খুট করে কেন জিজ্ঞাসা করলে বলে যে আমি জেগে আছি না ঘুমিয়ে আছি সেটা জানবার জন্যই ও অমনি ভাবে খুটখুট করে আমার বন্ধ দরজার কড়া নড়ে গভীর রাত্তিরে। যাক যে কথা বলছিলাম। বলছিলাম যে আমি হয়তো ঘুমোই না। হয়তো জেগে থাকি-কেননা সারা রাত্রি ধরে সব সময় চোখের ওপর কোনো না কোনো ছবি জেগে থাকে। কেন চেয়ে থাকি সব সময়? প্যারা স্বর্গ থেকে ভগবান যদি চেয়ে থাকেন তা হলে নিশ্চয়ই দেখেন তাঁর পায়ের তলায় গভীর গভীর ঘন কালো শূন্যে একজোড়া মেঘ। আর এই দুটো চোখ তাঁরদিকে বা তাঁকে না দেখে কিন্তু তাঁর দিকে লক্ষ্য করে, চেয়ে আছে। ভগবানের হাতের কাছে সৃষ্টির আলোর দুইটা আছে, আকাঙ্খা করে আছেন কখন এই চোখ দুটো মুজে আসবে ঘুমে আর তিনি আলোটা নিভিয়ে দিয়ে সৃষ্টির রাত্রি সৃষ্টি করবেন-অর্থাৎ চলতি ভাষায় প্রলয় ঘটিয়ে দেবেন। উনি যেন আমাকে মানুষকে প্রাণীকে ঘুম পাড়াতে বলেছেন, ঘুমুলেই আলো নিভিয়ে দেবেন কিন্তু মানুষ প্রাণী সবই আমার মতো কিংবা শুধু আমি একলাই বাচ্চা ছেলের মতো খ্যাট খ্যাট করে চেয়ে আছি মায়ের মুখের দিকে।

চোখ মুধলেই আলো নিভিয়ে মা উঠে চলে যাবেন। আমার এই চোখ দুটো ভেতরে বাইরে বন্ধ হলেই ভগবান সৃষ্টির সুইচটা টিপে সব আলো নিভিয়ে দেবেন। তাই আমি ঘুমাইনা। আমার দুটো চোখ ওঁর পায়ের তলায় দুটো পলকহীন পুরো খোলা চোখ শুধু দুটো চোখ আর কিছুনা দুটো পলকহীন পুরো খোলা চোখ চেয়ে আছে, যেন পাহারা দিচ্ছে যাচ্ছে সৃষ্টি অন্ধকার হয়ে যায় পাছে নিভে যায় প্রাণ। পাছে ঘটে যায় প্রলয়। আমি সেই প্রলয়কে যেন পাহারা দিয়ে আছি চোখ মেলে রেখে।

হ্যাঁ আমি চোখ মেলেই আছি। ঘুমিয়ে হোক জেগে হোক আমি চোখ মেলে আছি আমার সামনে। অনেকক্ষণ ধরে চোখ মেলে আছি। যে চাঁদটা আমার সামনে, মেঝে থেকে একমানুষ উঁচুতে যে জানলা, সেই জানলার চৌকোর ঠিক মাঝখানে ছিল একটা জলন্ত গোমেদের মতো সেই চাঁদটা জানলার নিচের চৌকাঠটারও তলায় হারিয়ে গেছে আর এই চতুস্কোনটা গাঢ় নীল হয়ে গেছে। শুধু একটা দুধ দুধ আলোর প্রলেপ তখনো লেগে রয়েছে ছোট্ট এক চৌকো বুকের মতো টুক্‌রো আকাশটায়। আমার দৃষ্টিটাও আস্তে আস্তে জানলার নিচের চৌকাঠ থেকে নিচে গড়িয়ে পড়তে থাকে, পড়তে পড়তে থামে কোমর থেকে একহাত উচুঁতে একটা জায়গায়। দেওয়ালের এই জায়গাটায় প্লাস্টার নাই, কখন কবে খসে গেছে আমার হিসেবে নাই। বুড়ি বলেছে আমার এ ঘরে বাস আরম্ভের আগে প্লাস্টার ছিল। নো ধরেছে আমার বাস আরম্ভের অনেক পরে অর্থাৎ প্রকারান্তরে বুড়ি বলতে চেয়েছে আমি নিজেই এই নোনার উৎস। আমি নিজের এই নোনার উৎস কিনা জানিনা কিন্তু অনেকদিন হলো এই নোনা ধরা, মাঝে মাঝে ছাতা পড়া ছোট্ট ঘরটার সঙ্গে মিশে গেছি। এটা আমার একটা খোলস, এই দেহ ছাড়াও আর একটা খোলসে পরিশ্রান্ত হয়ে গেছে।

খোলস বলে পিরান খায় খামার মতো আমার তেকে পৃথক কিছুর মতো নয়, এ আর একটা চামড়ার মতো। যা বলছিলাম আমি বুড়ো মানুষ একটুখানি বলে তৃপ্তি পাইনা। একসঙ্গে অনেকটা, অনেকটা বলতে চাই, কথার হাত বাড়িয়ে অনেক দূরের অতীতের শ্যাওলা টেনে হিঁচড়ে সরিয়ে ফেলে বর্তমানের কাকচক্ষু জলটুকু আবিষ্কার করতে চাই, হ্যাঁ, যা বলছিলাম। বলছিলাম যে আমার সামনে মেঝে থেকে একহাত উঁচুতে একটুকরো দেওয়ালে কয়েকটা লাল ইট ফেঁপে ধূলিয়া হয়ে গেছে। চোখে দেখেই বুঝতে পারি খুব মসৃণ ধূলি। হয়তো ফুলের রেণুর মতো স্পর্শ? স্পর্শে যেন লাল মখমল। এক এক রকম মখমলের এক এক রকম স্পর্শ। লাল মখমলের এক রকম আবার সবুজ মখমলের অন্যরকম। রঙও আমার স্পর্শের স্বাদ বদলে দেয়। জানিনা অন্য মানুষের ক্ষেত্রে কী হয়!

মনে মনে এই স্পর্শের স্বাদটা নিতে নিতে আমার মনের একটা আশ্চর্য নিয়মে পরিবেশটা আমার বদলে গেল। সামনের এই দেওয়ালটার ঠিক মুখোমুখি আর একটা দেওয়াল, আমার মাথার ঠিক পিছনে, কালচে কালচে পুরোনো সবুজ রঙের আমিন দু'পাল্লার শীর্ন দরজাটার ঠিক মাথার ওপরে যে জিরো ওয়াটের মিট্‌মিট আলোটাকে আমি সারাদিন সারারাত জ্বেলে রাখি সেই ছোট্ট গোল লালচে ডিমের মতো ইলেকট্রিক বালবের আলোটা সহসা একটা ঝড় হয়ে গেল। হাজার হাজার শক্তির একটা ঝড়। ঝিনা কাচের একটা বিপুল ঝড়; আর সামনে দেওয়ালে সিলিং থেকে মেঝে পর্যন্ত পুরু ভারী

একখানা লাল মখমল। ভাঁজে ভাঁজে ঐ ঝড়ের আলো ঝলমল করছে। মখমলটায় ভাঁজ উঠছে, ভাঁজ নামছে ঢেউয়ের মতো। আর আমার পায়ের ঠিক সামনে মেঝেটায় মার্বেল। আমার এই স্বপ্নটার বা জেগে স্বপ্ন দেখা বা স্বপ্ন জেগে দেখা এই দৃশ্যটার কথা অন্যদের বললে কেউ বিশ্বাস করবেনা। বলবে যেমন বুড়ি বারংবার বলে আমার মতিভ্রম কাটছে। বলুক, তবু জানি আমার কাছে একটা সত্যি। আমার মন, আমার ভিতরে অনেক ভিতরে রূপকথার দীঘির জলের গভীরে মানকোটার মধ্যে বন্দী ভ্রমরের মতো যে মন, আমার সেই অনেক ভিতরের মন অনেক দূরের মন এমনি একটা ঘরে সবসময় বাস করে, তাই আমার সেই ঘরে আর এই ঘরে ভেদ ঘুরে যায় মুহুর্মুহু। তাই আমি এখানে নিশ্চিন্ত মনে বাস করি। আসলে আবাস মতোই আমাদের মন-গড়া। আমরা মন দিয়ে আমাদের আবাস গড়ে নিই। আমার আসল বাসের ঘরখানা আমার মনের ভেতর এটাকে আমি মন থেকে তুলি যেখানে সেখানে বসিয়ে নিতে পারি। স্বপ্নেও পারি আবার জাগরণেও পারি। কেননা, আমি স্বাধীন, স্বাধীন, স্বাধীন। যেমন খোসা ছাড়া ফল নেই। তেমনি আবাসের খোসা ছাড়া মানুষ নেই। খোসাটা যেমন ফলের নিত্যসঙ্গী, আর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত। তেমনি মানুষের আবাসটা তার নিত্যসঙ্গী জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত। খোসার মধ্যে শাঁস, তার ভেতর বীজ, এই নিয়ে ফল। তেমনি মানুষ, তার সহজাত আবাস, তার ভেতর সে, আবার এরও ভেতর তার বীজ, তার অনেক ভেতরের অনেক দূরের মন। মন? এটা মন কিনা তাও জানিনা। মন একটা কথা, একটা ধারণা। তাই এটা হয়তো মন নয়, এটা তার আদি, ওপর ঘোড়ার ঘোড়া। এই ঘরখানা, তার ভেতরে আমি, তারও ভেতরে আমার বীজ, এই নিয়ে একটা ফল।

বিজ্ঞানে কী বলে তার খবরে দরকার নেই। আমার মনে হয় এই বীজটাই এই শাঁসটাকে তৈরী করে আর শাঁসের সঙ্গে যোগ সাজসে সেইই তৈরী করে খোসাটা। আমার এই হাজার হাজার বাড়ির ঝড়ওলা। চতুর্দিকে লাল পুরু পুরু মখমলের দেওয়াল ঘেরা ঘরখানাতে আমি আর আবার বীজ উভয়ে মিলে তৈরি করেছি। আমি যেখানেই থাকিনা কেন, স্থানের যে কোনো কোনে, সেখানেই আমি আমার এই ঘরখানাকে তৈরী করে নিই।

আামার এই খোসাটার ওপর কে যেন বাইরে থেকে ঠোকর দিচ্ছে। রাত্রিতে বাদুড়ে ঠোকর দিচ্ছে কোনো ফলে। খোসাটা শক্ত তাই টুক টুক শব্দ করছে। শক্ত হাড়ের ঠোঁটটা নিঃশব্দে ফলের শাঁসে হয়ে যাচ্ছে না। না, না, না ঠুক ঠুক শব্দ তো নয়, দ্রুতলয়ের টর্‌র্‌র্ টর্‌র্‌র্ ধরনের শব্দ। আমার দরজায় কড়া নাড়ছে। আমার এই ঘরের দরজায়। কড়া নড়লেই কি দরজা খোলা যায়? আমি খুলি না। আমি তো কতো দরজায় কড়া নেড়েছি কই খোলেনিতো দরজাটা; আমার সেই স্বপ্নের দরজাটা। ধাপের পর

ধাপ সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠতে হয় সেই দরজায়। একটা ধাপ কালো মার্বেলের, তার পরেরটা বৈদ্যুতিক, তারও পরেরটা রূপোর মতো কিন্তু তার কোনো উচ্চতর ধাতু তৈরি তিনটে ধাপ মাত্র। হবেও বা!

স্বপ্ন তো গোনা নাই। তার পরে বিরাট বিরাট একটা দরজা তার ওপরে ডালিম বীজ রঙের পাথরের খিলেন বিরাট উঁচু দরজা, আসার ওপর আমি তার ওপরে আমি আমার তার ওপরে এমনি করে একাত্তর বার দাঁড়ালেও সে নাই খিলেনটা ছুঁতে পারিনা। পাল্লা দুটোও রুমি পাথার রঙের ইস্পাতের বা ইস্পাতরঙের পাথরের। পারা দরজাটা মুখ বুজে থাকে। তার মাঝ বরাবর, আমার মাথা বরারব যে দুটো বড় বড় পিতল বা কাঁসা বা সোনার কড়া সেই কড়া দুটোকে প্রাণপণে নাড়া দেই। খোলেনা। ঝনঝন শব্দ হয়। ওপর থেকে শব্দটা প্রতিফলিত হয়ে হাজার গুণ বেড়ে ফিরে আসে। মনে হয় ওপারে অনেক অনেক স্ফাটিকের, নানা রঙের স্ফাটিকের। প্রাসাদ অট্টালিকা চত্বরে শব্দটা ঘা খেয়ে ফিরে আসে। কিন্তু খোলেনা। দরজা খোলে না। প্যারা আবার দ্রুত পায়ের আওয়াজ ওঠে। কিন্তু আমি খুলি না। দরজায় ঘা দিলেই কি দরজা খুলতে হবে? সংসারে রাত্রে দিনে অষ্টপ্রহরে কতো দরজায় কতো ঘা পড়েছে। কোথাও শব্দ উঠছে কোথাও শব্দ নেই। কোনো দেবদারু গাছের উই মাথায় উপর হলুদ হলুদ সবুজ পাতার ওপর আলো এসে দরজা ঠেলছিল আমি তার শব্দ শুনতে পেয়েছিলাম। কবে কোথায় জানি। বলবো কোনোদিন শোনাবো কোনদিন। না অন্য কাউকে শোনাবো না আমি আমাকেই আবার শোনাবো। অনেকবার শুনিয়েছি আবার শোনাবো।

শোনো পাহাড়ের ওপর একলা একটা দেবদারু গাছের মাথায় হলুদ হলুদ সবুজ পাতার ওপর সদ্য ভাঙা সকালের আলো এসে দরজা ঠেলছে আমি শুনতে পাচ্ছি। মাটির দরজায় পনপন করে বৃষ্টি পড়ছে। দরজা খোলা চাইছে। সমুদ্রের জলকে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে তাকে ঢেউয়ে ঢেউয়ে উদভ্রান্ত করে দুরন্ত বায়ু কী একটা দরজা খুলতে বলছে।

আমি এই দেবদারু গাছ, এই টুপটুপ করে পড়া বৃষ্টি, বই দূরন্ত বায়ু দেখেছি; দেবদারু পড়ে আছে আলোর হাতের ধাক্কা, ঝিলিক মারা ধাক্কা, টুপটুপ করে পড় বৃষ্টির মটির প্রতি দ্বার খোলো দ্বার খোলো এই অনুনয়, আর দুরন্ত বায়ুর ময়ূর সমস্ত দেহটা দিয়ে সমুদ্রের দরজায় আছড়ে আছড়ে পড়া আমি দেখেছি। প্যারা আর ঐ দেবদারু গাছ, ঐ বৃষ্টি আর ঐ সমুদ্র ঐ আলো আমার বাইরে থেকে হেঁটে এসে আমার ভেতরে দাঁড়িয়েছে। ওরা আমার সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে আমার স্মৃতির রূপ ধরে। ওরাও আমি হয়ে গেছে। আজ তাই মাঝে মাঝে আমার ভিতরের সরল দেবদারু গাছটার

মগডালের পাতায় আমার ভিতরের আলো, বরখাস্ত করে অদৃশ্য কঙ্কনে ঝিলিক তুলি তুলি, তাই কখনো কখনো আমার মনের ভেতরে টুপটাপ বৃষ্টি আমার মনের মাটি অনুনয় করে দরজা খুলতে আবার কোন সময়ে মনের আগরে মনের ঝড় আছড়ে আছড়ে পড়ে শন্‌শন্‌ করে ওঠে দরজা খোলো, দরজা খেলো।

টর্‌র্‌র্‌ টর্‌র্‌র্‌ করে ওঠে আমার এই ছোট্ট ঘরের দরজার বাইরের একটা কড়া। না, আমি খুলবো না। আবার কড়া টর্‌র্‌র্‌ টর্‌র্‌র্‌ করে। না আমি খুলবো না। আবার টর্‌র্‌র্‌ করে। না আমি খুলবো না। আমি অনেকের দরজায় কড়া নেড়েছি সেটা খোলেনি। খালি আমার হাতের আঙ্গুলে অদৃশ্য কড়া পরে গেছে। না আমি শুনবো না। কিন্তু ঐ শব্দের স্পর্শ লেগে আমার সামনে লাল মখমলের পর্দাটা খসে পড়ে মিলিয়ে গেল। মিলিয়ে গেল হাজার বাতির ঝড়টা, হারিয়ে গেল পায়ের কাছে মার্বেল। যে ময়ূরটা পেখম তুলে আমাকে ঘিরে রেখেছিল সেই ময়ূরটা পেখম গুটিয়ে মরে গেল। না আমি খুলবো না। তবু বুড়ি নাছোড় বান্দা। টর্‌র্‌র্‌ টর্‌র্‌র্‌ টর্‌র্‌র্‌। চিৎকার করে উঠি- আমি জেগে আছি। শুনতে পায়নি। আমি ঘুমাইনি। আমি জেগে আছি। কয়েক নিমেষ চুপ। রাত্রিটা সমস্ত শব্দকে কালো কাপড়ে কালির মতো শুষে নিয়েছে। হঠাৎ শুনি খ্যাক খ্যাক খ্যাক করে হাসতে হাসতে দরজার ওপাশে বুড়ি বুঝি দরজা থেকে সরে গেল।

খ্যাক খ্যাক- এক রাত্রিতে এক শ্মশানে শুনেছিলাম কয়েকটা শেয়াল একটা বিশেষ বিতার পাশ দিয়ে আমার প্রায় গা ঘেঁষে ছুটে গিয়েছিল।

না আমার গা ঘেঁষে ছুটে যায়নি। আমার থেকে বেশ খানিকটা দূরে চিতার পাশ দিয়ে ছুটে গিয়েছিল। কিন্তু নিমেষের জন্য মনে হয়েছিল ঠিক যেন আমার গা ষেঁষে চলে গেল। সময়টা রাত্রি। আকাশে চাঁদ ছিল। আমার জন্মের সময় চাঁদটা আকাশের কোথায় ছিল কে জানে। কিন্তু নিমেষের জন্য আমার মনে হয়েছিল চাঁদটা সে সময় বোধ হয় ঐ খানেই ছিল।

রাত্রিতে ভূমিষ্ট হয় প্রথম চোখ গুলি আশেপাশের দেওয়ালের কোনো ফাঁক দিয়ে তা জানলা হোক দরজা হোক এখানো কাঁক দিয়ে চাঁদটাকে বোধকরি আকাশের ঠিক ঐ খানেই দেখেছিলাম। তা যাক আকশে চাঁদ ছিল। আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম দাড়িয়ে ছিলাম না কোনো কিছুতে ঠেস দিয়ে ছিলাম কিংবা শুয়ে বা বসেছিলাম মনে নাই, তবে ছিলাম। একটা প্রকান্ড চওড়া নদীর এক তীরের পাড়ে বালির ওপর ছিলাম। মনে আছে বরং বলবো এখনো যেন দেখছি " সামনে থেকে বালির পাড় ঢালু হয়ে নেমে গেছে

গড়িয়ে গেছে নদীর জল পর্যন্ত। ঐ নদীর মধ্যে যে আকাশ সেই আকাশে চাঁদটাকে দেখেছিলাম। নদীল জল গায়ে ঐ চাঁদটাকে ওড়ো করে মেঘে সামনের দিকে, একটা নিভু নিভু চিতার দিকে, প্রথাও একটা এককোষী এ্যামিবার মতো বা কোনো স্বচ্ছ জেলিফিসের মতো নকল অঙ্গপ্রতঙ্গ বের করে একবার গড়িয়ে আসছিল আবার পরক্ষণেই পিছিয়ে যাচ্ছিল। স্বচ্ছ জেলিফিসের ভিতরে চাঁদটা যেন টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে গেছে ওটাকে তা হজম করতে পারেনি। হজম করার জন্যই কি জলটা আড়ামোড়া খাচ্ছিল? কিংবা ঐ নিভু নিভু চিতাটাকে খেতে চেয়েছিল। ঐ খানে ঐ জল, আর ঐ জলের ধারে চিতা আর এই খানে বালির পাহাড় আমি এর মধ্যে অনেকটা ব্যবধান দন্তব্য করতে করতে ঐখানে যেতে গেলে অনেকটা সময় লাগতো আমার। কতক্ষণ সময়? আমি সময়ের হিসেব নিয়ে মাথা ঘামাইনা। একবার যাওয়ার পর আবার খিদে পেলে বুঝি সময় পেরিয়ে গেছে। যাক্ না ওকথা। ঐ ভিতরে চাঁদ গ্রাম করা জেলিফিসের মতো জলির মুখের সামনে নিভু নিভু চিতার পাশ দিয়ে খ্যাক খ্যাক করে করতে কয়েকটা শেয়াল ছুটে গিয়েছিল। বেশ কিছুটা দূর দিয়ে কিন্তু আমার মনে হয়েছিল আমার গা ঘেঁষে চলে গেল। তখন অনেক রাত্রি। বেশ পুরু রাত্রি, যদিও তার মধ্যে চাঁদটা গুলে নিয়েছিল তবুও তরল হয়নি। কিন্তু চিতার পাশে ঐ ছুটন্ত শেয়াল গুলোর ছায়া পড়েছিল। ওরা প্রথমে চিতার আশে পাশে ওকে বেড়াল তখনো বিতার মাঝখানে লালচে লালচে আগুন বোধ হয় ছিল। অন্তঃত আমার তাই মনে আছে। তারপর এক মুহূর্ত, আমি জড় হায় গিয়েছিলাম। ওরাও বোধ করি জড় হয়ে চিতার চার পাশে জড়ো হয়েছিল। তারপর মনে হলো আমার নিচে বালি যেন চলতে আরম্ভ করেছে, প্রকান্ড সাপের মতো নদীর জলে নেমে পড়তে যাচ্ছে। আমি চিৎকার করে পালিয়ে ছিলাম। শেয়ালগুলিও চিৎকার করে পালিয়ে গিয়েছিল। হোয়া, হোয়া, হোয়া, হোয়া.....

ঐ চিতায় নাকি আমার পিতা শেষ শুয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর খবর পেয়ে অনেক দূর থেকে ছুটেএসেছিলাম তাঁকে দেখতে। আসতে আসতে দিনের পর রাত এল, আবার দিন আবার রাত আবার দিন আবার তারপর রাত। আমি ঐ রাতটায় পৌঁছে গেলাম। যে রাত্রে চাঁদটা আকাশের সেই অংশে ছিল যে অংশে সেদিন আমার জন্ম লগ্ন। দূর থেকে রাত্রির গহ্বরে শূন্য হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। মনে হয়েছিল ওই চিতায় আমার পিতা নয় আমিই হয়তো শেষ শুয়েছিলাম। যাই হোক আমার নিচে বালিটা চলতে আরম্ভ করল আমি পালিয়ে এসেছিলাম।

আমি পালিয়ে এসেছি আমার জন্মের গ্রাম থেকে অনেক অনেকদিন আগে। বাবা হারিয়ে গেছেন শুধু "ছিলেন" হয়ে গেছে। তারপর থেকে আমি আর সেখানে যাইনি। আমার সেই সেই গ্রামটা আমার

কাছ থেকে অনেক অনেক দূরে সরে গেছে কোথাও আর নেই। তার আর আমার মাঝখানে এখন একটা দুস্তর কাল। আর, কালের উজানে যাওয়া নাই। তবুও আছে আমার আর একটা আকাশের মতো। আমার মনের ঋতু ভেদে নানান আকাম। হাজার হাজার বাতির ঝাড়-ঝোলানো, মখমল ঘেরা, মার্বেল পাতা ঘর একখান। আর একখানা ঘর, আমার মনের আরেক ঋতুর ঘর। ধানের সদ্য ফোটা শিষের গন্ধ তার দেওয়াল, মাঠের মাঝে বহুদূরে কোনো বাগান থেকে ভাসতে ভাসতে আসা ঢেউয়ের মতো ওঠানামা ঘুঘুর ডাক দিয়ে তার টালিটা ছাওয়া। আর সেখানে একমাত্র সরঞ্জাম তেঁতুল গাছের গুঁড়িগুঁড়ি হলুদ হলুদ ফুলের একটা গালিচা-ক্রমশ: পুরু হয়ে আসা গালিচা। আমি কখনো কখনো বাসা বদল করি; ঐ ঘরখানায় ঢুকে পড়ি আমার প্রাসাদটার বদলে।

আমি কিছুক্ষণ নিজের থেকে পালিয়ে গিয়েছিলাম। নতুন করে যখন আবার অস্তি বোধ ফিরে এল তখন দেখি আমার ঘরের মেঝে থেকে একমানুষ ওপরে যে গবাক্ষ আমার ঘরের চোখ সেই গবাক্ষ দিয়ে একটা বিরাট বর্শার ফলকের মতো হলুদ সোনা রঙের সূর্যালোক ঢুকে পড়ে আমার পিছনের দেওয়ালে বিঁধে গেছে। যেখানে একখানি ক্যালেন্ডার ঠাঙ্গানো।

শরীরটা ঘুরিয়ে দেখি ক্যালেন্ডারের একটা তারিখকে এই আলোর বর্শাটা বিঁধেছে। অন্য কী বলবে জানিনা। এটাই আমার কাছে আজকের সঠিক তারিখ। সকাল বেলায় সূর্যালোক সোজা ঢুকে ক্যালেন্ডারের যেখানে পড়ে সেখানে যে তারিখ সেইই তারিখ, আমার নিজস্ব তারিখ। আমার তারিখ যে সব সময় একই থাকে তা নয়। বদলায়। কখনো ধীরে ধীরে কখনো তাড়াতাড়ি। আজ দেখি ১৯৬৮ সালের উনিশে আগষ্ট। সাত আর একে আট, নয় আর সাতে ষোল। গুনে দেখি আমার বয়স হলো একাত্তর। আমার নাকি জন্ম আঠারশ সাতানব্বই সালে উনিশে আগষ্ট। কে বলেছে আমার জন্মে আঠারোশ সাতানব্বই সালে? শুনেছি, হয়তো মাবাবার কাছে। বাবার কথা ফুরিয়ে গেছে, মায়ের কথাও। মা আমার কাছে একটা কথা হয়ে আছে। তাছাড়া আমার যে মা বাবা ছিল তা আমার কাছে গল্প কথার মতো। একটা সত্যি না গল্প এ সম্পর্কে নিজেই স্থির নিশ্চয় হতে পারিনা। সত্যি হলে গল্পের মতন আর গল্প হলে সত্যির মতো। আসলে আমি যে কোনোদিন জন্মেছিলাম অর্থাৎ তথাকথিত জন্মের আগে ছিলাম না এটা মনের একটা গনিত মাত্র। বিশ্বাসে এর শেকড় নাই। মনে হয় আমি সব সময় ছিলাম, মনে হয় সব সময় থাকবো। কিংবা উলটো দিক থেকে ভাবলে মনে হয় কোনোদিনই ছিলাম না আজ ও নেই পরেও থাকবো না। তাই এক নিমেষে মনে হয়েছিল: চিতায় যে চিতার চারদিকে শেয়ালেরা চাঁদের আলোয় জড়ো হয়েছিল সেই চিতায় আমি কবে পুড়ে ছাই হয়ে গেছি। আঠারোশ

সাতানব্বই কোথাও নাই। অন্তত: আমার মধ্যে তার কোনো চিহ্ন নাই। আর বয়স? আমার বয়স একাত্তরও হাত পারে, একাশিও হতে পারে আবার একচল্লিশ একত্রিশও হতে পারে। মনের মধ্যে এমন কোনো বানমাপা লাঠি পোঁতা দেখিনা যার চিহ্ন দেখে সময়ের ক্রমশ: উঁচু হয়ে ওঠা বাইশ বত্রিশ বিয়াল্লিশ ইত্যাদির তলগুলো মাপাতে পারবো। আসলে আমার মনে বয়সটা তো যানের মতো কেঁপে ওঠেনি। তাছাড়া কালের হিসেবটা আমি জানিনা। জোর করে লোকে আমাকে মানাতে পারে কিন্তু মনে মনে তা আমি মানি না। এই সব সংখ্যা সাজানো চিহ্ন গুলি এই আঠারোশ সাতানব্বইয়ের মতো চিহ্নগুলো আমার কাছে নাই একেবারেই নাই। আমার কোনো বয়স নাই। কেননা বয়স বলে কোনো কিছু আমি হাতড়ে খুঁজে পাইনা। মন হাতড়ে যা খুঁজে পাই তা একটা অনাদ্যন্তে অস্তিত্বের অস্পষ্ট অনুভূতি। অর্থাৎ আমি সব সময় ছিলাম, সব সময় থাকবো। আর এই মুহূর্তে আমি সব কালের বাইরে।

তবু একটা হিসেব একাত্তর বছর তৈরি হোলো। অর্থাৎ এই দেওয়ালে, এই দেওয়ালে নাহোক, একটা দেওয়ালে না হোক, অনেক অনেক দেওয়ালে এমনি ক্যালেন্ডারের মতো একাত্তরটা ক্যালেন্ডার একাত্তর বার টাঙ্গানো হয়েছে আর একাত্তর বার খুলে ফেলে দেওয়া হয়েছে। অতএব আমার বয়স একাত্তর। কিন্তু আমিতো আমার ভেতরে ক্যালেন্ডার বদলাই নি। আমার মনে এমনি কোনো ক্যালেন্ডার নাই- সংখ্যা নাই, সংখ্যার সারি নাই। অতএব আমার বয়স নাই। এইতো সেদিন সেই পাহাড়ের মাথায় যে দেবদারু তার পাতায় আলোর হাতের ধাক্কা দেখলাম, এই তো সেদিন দেখলাম টুপটাপ বৃষ্টি মাটির দরজায় ঘা দিচ্ছে, এইতে সেদিনও দেখলাম সমুদ্রে দুরন্ত হাওয়া জলের দরজাটা খুলতে চাইছে, জলের দরজা খুলছেনা, মুহুর্মুহু বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এইতো সেদিন! সেই তারা এক একটা ছবি এক জায়গায় পাশাপাশি গায়ে গা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিংবা পালকির বেহারার মতো আমার এই মনের পালকিটা বয়ে নিয়ে চলেছে। না, বয়ে নিয়ে চলেনি, কাঁধে কাঁধে শুধু ধরে রয়েছে। হিস্‌গ্লো, হিস্‌গ্লো, পালকি আমার এই মন ওরা সবাই মিলে ধরে রয়েছে কাঁধে কাঁধে। এক কাধে। একটার থেকে অন্যটায় কোন ব্যবধান আমার বোধের মধ্যে নাই। অর্থাৎ এক কথায় আমার বয়স নাই। তাছাড়া আমি কোনো ক্যালেন্ডারের ধার ধারিনা। সূর্যের আলোর বর্শাটা। প্রচলিত ক্যালেন্ডারের- তা পুরোনো হোক নতুন হোক তথাকথিত ক্যালেন্ডারের তা পুরোনো হোক নতুন হোক তথাকথিত ক্যালেন্ডারের যেখানটা ছোঁয় সেটাই আমার বছরের তারিখ। তা ছাড়া আমি ক্যালেন্ডার বদলাই না। আমার ঐ ক্যালেন্ডারের যে কতোদিন ওখানে আছে তা আমি জানিনা। এটাযে আটষট্টি তাও আমি জানিনা। এট বাহাত্তর বিরাশিও হতে পারে।

একদিন বুড়িকে ধরে ছিলাম হাতে নাতে ক্যালেন্ডার বদলাতে। বারণ করেছিলাম আমার ঘরের ক্যালেন্ডার বদলে দিবেন না। কেননা, কারণ জিজ্ঞাসা করায় বলেছিলাম, আমার মনের কোনো ক্যালেন্ডার নাই ঘরেরও থাকবেনা। কেননা এই ঘরটা আমার মন। জানিনা এই ক্যালেন্ডারটা যখনকার, এর আগে কী ছিল। জানার দরকার নাই আমার কাছে সব সমান। শুধু তারিখটা বদলায়; সূর্যের আলো সকাল বেলায় একটা তারিখে পড়ে, তারিখে বদলে যায়। একই তারিখে হয় তো অনেকবার পড়ে কিংবা খুশি মতো যে কোনো তারিখে পড়ে। আজ পড়েছে ১৯শে আগষ্ট, হয়তো কাল আমার আজও যা কালও তাই তবু হয়তো কাল পড়বে বাইশে জুন। অর্থাৎ উনিশে আগষ্টের বাইশে জুন। ঠিক এটাই ঠিক। এটাই আমার মনের তারিখ গোনা। এটাই আমার প্রকৃত কালক্রম। কালের মুখে ছাই দিয়ে আমার চলা বা বাঁচা বা নিছক থাকা।

রোদ্দুরের বর্শাটা ক্যালেন্ডার থেকে সরে দরজায় পড়ল। এবার আমার দরজা খোলার পালা। রোদ্দুর পড়লেই আমি দরজা খুলে দিই। দরজাটা খুলে দিলেই ঐ দরজা দিয়ে আমার জীবনে একটা দিন ঢুকে পড়ে। তার কিছুক্ষণ পরে আসে বুড়ি ও খাবার আনে চা আনে। বলেছিতো আমি দিনগুনি বা সময়ের মাপ করি একটা ক্ষিদে থেকে অন্য একটা ক্ষিদেতে নতুনকরে ক্ষিদে পায় বুঝি সময় কেটে গেছে। দরজা খোলে বুঝি দিন হয়েছে। বুড়ি ঢোকেক বুঝি একটা দৃশান্ত হয়। কিন্তু এই দৃশ্যন্তরে কী ঘটবে জানিনা।

বুড়ি ঘরে ঢুকেই হাসে, খ্যাক খ্যাক শেয়ালের মতো হাসিময় ও হাসিটা রাত্রির যখন জানলার চৌকো দিয়ে হয় চাঁদ দেখা যায় কিংবা তারা। এ এক অন্য ধরনের হাসি। খুক খুক করে হাসা। যেন শুকনো গলার। গলাটা যেন একটা ধাতুর পাইপ সেই পাইপে নখের খোঁচা। আমি মুখের দিকে চাইনা। কোনোদিনই চাইনা। ঐ হাসিটা শুনতে শুনতে যে ধরনের মুখ মনের ওপর ভেসে ওঠে সেই ধরনের এক খানা মুখ মনে মনে দেখি। ঘরের মধ্যে ভাঙ্গা টেবিলে চা খাবারের ট্রেখানা ঠক করে নামিয়ে কিছুনা কিছু বলে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। শুকনো কাপড়ের খড়খড় শব্দ ওঠে। কিংবা যে শব্দ ওঠে বিচালির আটি খুলে ফেললে। কী জানি কে ও কেন এমন খড় খড়ে শাড়ি পরে আসে? আমার কেমন গা শিরশির করে। আজকেও গা শিরশির করে উঠল। যেন চামড়ার ওপর খুব আলতো করে কে ক্ষুর বুলিয়ে দিল। হাসিটোও যেন আলতো করে ধরা ক্ষুরের মতো গায়ের ওপর বুলিয়ে গেল।.....

দেখলাম, মেঝে বরাবর চেয়ে থেকেই দেখলাম, ও ক্যালেন্ডার খানা বয়ে নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। এই! ক্যালেন্ডার নিয়ে যাচ্ছো কেন? খুক খুক খুক এটা গত বছরের। হোক গত বছরের থাক। না থাকবে না, বছর গেছে ক্যালেন্ডারও যাবে। তার মানে? তার মানে এটা উনসত্তর। তোমার উনসত্তর আমি মানিনা। আজ আমার উনিশ শ আটষট্টির ঊনিশে আগষ্ট।

তোমার হুকুমে? গলার স্বরটা শুনে হঠাৎ আমার একটা পুরোনো খেদ মনে পড়ে গেল, মনে পড়ে গেল একখানি খাট। গন্ধটা একটা সস্তা সেপ্টের কিংবা একটা ফুলের মালার। খাটখানার শিয়রে একটা জাফরি। বালিশে মাথা রেখে ঘাড় ক্যাৎ করে এই জাফরির ভিতর দিয়ে দেখেছিলাম একখানা মুখ। মুখখানা আর মনে নাই। এখানে একটু ওখানে আধটু মনে আছে। কানের পাশে একটুখানি মনে পড়ে, চোয়ালের একটুখানি তাও এক নিমেষের একটু করে সময়ে না, সময় নাই মনে পড়ে একটু একটু, টুকরো টুকরো। সেদিন যেমন শ্মশানে চাঁদনি রাতে চিতার ওপাশে জেলি ফিসের মতো হজম নদীটা চাদটাকে গিলে ভেতরে টুকরো করে ভেঙ্গে ফেলে করতে চাইছিল, সেই রকম টুকরো টুকরো। আমার মন এই মুখখানাকে এই মুখের চাঁদটাকে গিলে ভিতরে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে। হজম করার ব্যর্থ চেষ্টায়। টুক্‌রো গুলি ঝিকমিক করছে। মুখখানা মনে পড়েনা। কিন্তু মনে হয় মনে পড়তে পারতো। মনটাকে, মনের চঞ্চল জলটাকে স্থির করে দাঁড় করাতে পারলে ওটা গোল হয়ে মনে পড়তে পারতো কিংবা তখনো দেখা যেতো যে মন তাকে অনেক খানিই খেয়ে ফেলেছে।

কিংবা নারীকে আমি সব সময়ই কী একটা জাফরির ভেতর দিয়ে দেখেছি। যে মুখখানাকে আমি একখানা খাটের শিয়রে জাফরির ভেতর দিয়ে দেখেছি মনে করছি সেই মুখখানা একজন কোনো বিশেষ নারীর নয় হয়তো সব নারীর। যে গলার স্বর শুনে আমার একটা পুরোনো গন্ধ মনে পড়ে গেল, মনে পড়ল একখানা খাট সেই স্বরটাও আর একটা জাফরির মধ্য দিয়ে এল। দৃষ্টি আটকানো জাফরির নয়, শব্দ শেষো জাফরির। এই জাফরিটা কি আমার চোখের ওপর এঁটে বসে আছে কিংবা এঁটে বলে সে আছে আমার কানের সুরঙ্গের মুখেই কিংবা মনে? মনের ওপর মনপদার্থের তৈরি একটা জাফরি।

নারীকে আমি জাফরির আড়ালে দেখেছি। নারীর কণ্ঠস্বর আমি শব্দ শুষে নেওয়া নৈঃশব্দের জাফরির ভেতর দিয়ে শুনেছি। এখনো দেখি এখনো শুনি। আমি কি একটা-একটা কেন অনেক গুলি অনেক ধরনের জাফরির খোলে ঘেরা একটা শূন্যে বাস করছি? অনেকগুলি জাফরিরর ঘের আমার চারদিকে? চোখের জাফরি কানের জাফরি, স্বর্ণের জাফরি, পরিশেষে হয়তো মনের জাফরি। তাই

কোনো কিছুকে গোটা দেখিনা, কোনো শব্দকে গোটা শুনি না, কোনো কিছুকে গোটা স্পর্শ করতে পারিনা, কোনো কিছুকে গোটা অনুভব করতে পারিনা। পুরো অনুভব কি জানিনা। হয়তো আমি এখনো পুরো জন্মাই নি। কিংবা ঐ চিতায় পুড়ে আবার পুনর্জন্মের অপেক্ষা করছি। না, চিতায় পুড়ে নি:শ্বেষ হয়ে যাইনি একেবারে। আসলে সম্ভবত: আমি এখনো পুরো জন্মাইনি। জন্মাতে চলেছি। একটু একটু করে জন্মের দিকে এগিয়ে চলেছি। আঃ, যেদিন পুরো জন্মাবো সেদিন এই জাফরি গুলোর ওপাশ থেকে ওরা সব এপাশে এসে দাঁড়াবে।

"তোমার হুকুমের" আবার। জাফরির হে ধারে একখানা মুখ যেন মনে পড়ল। জাফরির এক একটা ফাঁকে মুখের এক একটা টুকরো। আর, এই টুকরো গুলি একসঙ্গে গায়ে গায়ে লেগে তো জুড়লই না বরং পরস্পরের থেকে আরও দূরে সরে গেল। আর মনে মনে সেই ভাঙ্গা টুকরো গুলি তাড়াতাড়ি জড়ো করতে গিয়ে বেন সেই তাড়াতাড়িতেই তারা কাছে দূরে ছত্রাকার হয়ে ছড়িয়ে পড়ে গেল। বুড়ো মানুষের কাঁপা হাতে, আমার মতো বুড়ো মানুষের কাঁপা হাতে, যদি স্বচ্ছ গোলাপী রঙের ডালিমের কোয়া ধরতে দাও তো তারা যেমন ছড়িয়ে পড়বে তেমনি। মেঝের ওপর পাতা চোখ দিয়েই দেখলাম বুড়ির শাড়ির রঙটা ডালিমের কোয়ার মতো। আর এক টুকরো। ঐ শব্দটা গলার ঐ স্বরটা একটা টুকরো, আর শাড়ির ঐ রঙটা আর এক টুকরো। দুটো জুড়ে একটা বেশ বড় টুকরো হোলো। প্রায় একটা গোটা মানুষ তৈরী হোলো হোলো বলে। হতে হতে কিন্তু হোলো না। প্যারা হতে হতে যেন ভেঙ্গে আবার টুকরো হয়ে গেল। হতাশ হয়ে বললামঃ ক্যালেন্ডারটা কেন নিয়ে যাচ্ছ? সাড়া পেলাম না। চলন্ত ক্যালেন্ডারটার দিকে চেয়ে দেখলাম। অন্য একটা তারিখে সূর্য্যের আলোর বর্শার একটা ভাঙ্গা টুকরো পড়েছে। বাইশে জুন। আর, ক্যালেন্ডারের মাথায় দড়ির ফাঁস সেই দড়ির ফাঁসের ভেতর একটা আঙ্গুল। গোটানো আঙ্গুল। টিকটিকির গায়ের রঙ এই আঙ্গুলটার। কিন্তু এই টিকটিকিটার পেটের ওপর কটা আংটি। আংটির পাথরটা, কী নাম যেন কী নাম যেন মনে পড়ে না, পাথরটা রক্তমুখী। আর একটা টুকরো। এই কয়েকটা টুকরো কাঁপতে কাঁপতে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে এক জায়গায় এসে জড়ো হোলো। কিন্তু কোনো মুখ গড়ে উঠলনা, গড়ে উঠল না কোনো চেহারা। শুধু গড়ে উঠল একটা কথা 'আমার স্ত্রী'। আমার স্ত্রী ছিলনা থাকতে থাকতে থাকেননি। কিছুকাল ছিলেন না। আবার কি করে এলেন? অর্থাৎ আমার স্ত্রী ছিলেন, এখনো আছেন, টুকরো হয়ে আছেন। আজ এই মুহূর্তে সেই টুকরোটা কোনো এক আকাশে উল্কার মতো ঘুরতে ঘুরতে ঘুরতে আবার এক নিমেষের জন্য আমার ধরা ছোঁয়ার মধ্যে এসে গেছেন। কিন্তু ঐ বুড়ি আমার স্ত্রী নয়। আমি ওর পেয়িং গেষ্ট। আমি ওপর ভাড়াটে, বারণ সত্ত্বেও ও আমার ঘরের ক্যালেন্ডারখানা জোর করে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তবু মনে হোলো ও আমার স্ত্রী

নয় আবার বটেও, এইতো সেদিনও মনে হোতো সব স্ত্রীলোকই আমার স্ত্রী। আমি সমস্ত স্ত্রী লোকের মধ্যে আমার স্ত্রীকে খুঁজে পেতাম। কিংবা আমার স্ত্রীকে খুঁজে পেতাম সমস্ত স্ত্রীর মধ্যে। এই স্ত্রী স্থানে নেই, কালে নাই, কোনো স্থানে কোনেদিন হয়তো ছিলনা, কোনোদিন হয়তো কালেই ছিলনা। তবে, কোথায় ছিল? আমিই কি আমার স্ত্রী?

তোমার হুকুম?

কেন? আমি কি আমাকে হুকুম করতে পারি না?

আমার এই হ্যাঁ-স্ত্রী-না-স্ত্রী- বাড়িউলি ইতোমধ্যে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল।

হঠাৎ চমকে উঠলাম। এই রইল নতুন ক্যালেন্ডার। এখন তোমার একাত্তর শেষ। এখন থেকে তুমি বাহাত্তরে বুড়ো। ক্যালেন্ডার নানা পাঁচ মাস একুশদিন পুরোনো হয়ে গিয়েছিল। আজ বাইশে জুন। প্যারা বিরক্ত হয়ে চিৎকার করে বললাম না ঊনিশে আগষ্ট ঊনিশশ আটষট্টি। কিন্তু আশ্চর্য! বাইশে জুন কথাটা চারধারে ঘুঙুরঁ আটা তাবুরিনের মতো বাজতে রইল বাইশে জুন বাইশে জুন বাইশে জুন। এক বাইশে জুন আমার বাবা মারা গিয়েছিলেন, আর এক বাইশে জুন আমার বিয়ে হয়েছিল। জুন মাসেই বো্ধ হয় কোনো এক তারিখে আমার প্রথম ছেলে হয়েছিল। আসল তারিখটা ধুয়ে মুছে গেছে মন থেকে তার জায়গা আগলে বসেছে বাইশে জুন। যে তারিখে আমি প্রথম সমুদ্র দেখি সেও বোধ হয় এই বাইশে জুন অনেক অনেক বাইশে জুন বৃষ্টি পড়েছে। আর সেই দেবদারু গাছের পাহাড় যেদিন প্রথম পদাষ্ঠন করলাম সেদিন বাইশে জুন না? বাইশে জুন তারিখটা মাথা নেড়ে বললে হ্যাঁ।

বুঝলে? আজ বাইশে জুন! কাঁপা পাইপের ভেতরে অদৃশ্য নলের খোঁটার মতো শব্দ করে হাসলে।

না না না মনের ভেতরে কে বারবার নি:শব্দে উচ্চারণ করে না না না ঊনিশে আগষ্ট। ঊনিশে আগষ্টটা শেষ হয় নাই। একী হোলো? মন কেন এই উনিশে আগষ্টকে আঁকড়ে রয়েছে? ঠিকই তো! আমি কি পুরোপুরি জন্মেছি যে ঊনিশে আগষ্ট ফুরিয়ে যাবে? তা ছাড়া এই ঊনিশে আগষ্ট তারিখটাকে ঘিরে তেঁতুল গাছের গুঁড়ি-গুঁড়ি হলুদ হলুদ ফুল ঝরে, শিরশির করে হাওয়া বয়, সেই হাওয়ায় ঘুঘুর ডাক ভেসে আসে আর বেদনায় বীজের মতো যে বেদনার রঙ সেই এক ধরনের বেদনা এই তারিখটার গায়ে ঠেস দিয়ে দিয়ে থাকে। ঊনিশে আগষ্ট মানে হলুদ হলুদ তেঁতুলের ফুল, ঝিরজিরে হাওয়া আর এক ধরনের আশ্চর্য্য গোলাপী রঙের বেদনা। আমার অনেক জন্মের যে জন্মটা সব চেয়ে সুন্দর, সেই জন্মের দিনে আমি এখন জন্মের বিস্ময়ে দেখি আমার মাথার ওবার শূন্যে তোলা হালকা পাহাড়ের মতো সুবজ

থেকে ছোট্ট ছোট্ট হলুদ হলুদ ফুল মরছে টুপটাপ বৃষ্টির মতো। এই কুল গুলির কোথাও না কোথাও একটু লালচে ছোট্ট ঠিক ছিল আর হাওয়া ছিল ঝির ঝির ঝির ঝির। লোকে বলতো আমার জন্ম আঠারোশ সাতানব্বইয়ের ঊনিশে আগষ্ট। আমি এই তারিখটা দিয়ে আমার এই অনেক জন্মের সবচেয়ে সুন্দর জন্ম, গোলাপী বেদনা ছাপানো জন্মটাকে চিহ্নিত করে রেখেছি। কিন্তু বাইশে জুন পায়ে ঘুঙুর বেঁধে চারধারে নাচতে থাকে।

শুধু বাইশে জুন নয়, আমি শুনেছি অনেক তারিখের পায়ে এমনি ঘুঙুর বাঁধা। জিপ্সী মেয়ের মতো এই তারিখ গুলি এখান থেকে ওখান, দেশ দেশান্তর ঘুরে বেড়ায়। যে বাইশে জুন সেদিন বাবার বিতার পাশে দাঁড়িয়েছিল সেই আবার দেখা দিয়েছিল আমার বাসর ঘরে এবারও অন্ধকারে তবে তার পায়ে বোধ করি মল ছিল ঘুঙুরের বদলে।

এই ঘুঙুরের শব্দটা শুনতে শুনতে হারিয়ে গেলাম। ধীরে ধীরে আমার ভিতরের একটা গহ্বরে আমাকে শুষে নিলো বেয়ে দেখি অদ্ভুত একটা আলোয় এ আমার ঘরের কোন যে জানলা সেই জানলা দিয়ে বর্শার মতো এগিয়ে আসা আলো নয়, আমার জিরো ওয়াটের দিনরাত জ্বেলে রাখা ইলেকট্রিক বাল্বটার আলো নয়। এ এক ধরনের আশ্চর্য্য আলো, একে সমুদ্রেও দেখিনি কখনো মাটিতেও না। চেয়ে দেখি এই আলোয় সারি সারি সারি দাঁড়িয়ে রয়েছে একাও একটা পাথরের রথের কাছাকাছি পাথরকাটা নর্ত্তকীদের মূর্তি প্রত্যেকে নাভির নিচে পাথরের ঢোলকটা ঝুলিয়ে নিয়েছে। পাথরের রথটা চলছে, চাকার তলায় বালি বসে যাচ্ছে সমুদ্রে নামছে রথটা খুব ধীরে ধীরে নামছে ঘোড়াগুলো নড়ছে একটু একটু আর এই চোলকবাদিনীরা সার বেঁধে তার একধারে না দু ধারেই দাঁড়িয়ে পড়েছে, তাদের ঢোলে শব্দ উঠছে। আশ্চর্য্য পায়ের মলে ঝম ঝম শব্দ উঠছে দেহের পাথর নরম পেশী হয়ে গেছে, পাথর রঙের পেশী, কিংবা পাথর পেশী হয়ে গেছে পেশী পাথর মাংসে আর পাথরে কোনো ভেদ নাই। তাদের মোটা মোটা হাতে কী একটা প্রবল ছন্দ নেচে উঠেছে আমি নিজের দু হাতের আঙ্গুল ছড়িয়ে একজনের হাতের বেড় মেপে অবাক হয়ে গেলাম। ওই ছন্দটা আমার শরীরেও সঞ্চরিত হয়ে গেল, বিদ্যুতের মতো। কোমরটা সরু। কোমর থেকে পিছলে পড়েছে এক ধরনের গোট। গোটটা মালার মতো ঝুলে রয়েছে আর এই গোট দিয়ে মোড়া ভীষণ ভারী অথচ ভীষণ হালকা পাছা দুটো অদ্ভুত ঢেউয়ে ঢেউয়ে দুলছে। দেহের এই অংশটাকে আমার একটা আলিঙ্গনে ধরতে পারিনা; আমর আলিঙ্গনের যে পরিধি সেই পরিধি ছাড়িয়ে ওরা ছাড়িয়ে রয়েছে। তার নিচে একজোড়া ভারী পা, কিন্তু ছন্দে হালকা হয়ে গেছে; এতো হালকা মনে হচ্ছে হাত দুটোকে চিৎ করে দশ আঙ্গুল ছড়িয়ে ওদের

একজনকে শূন্যে তুলতে পারবো। কিন্তু পারলাম না। একজনের পায়ে হাত দিতে তার গোটা দেহের ছন্দটা থরথর করতে করতে আমার সারা দেহে ছড়িয়ে গেল। ওদের কাউকে ধারন করার মতো শক্তি নাই, আলিঙ্গনে জড়ানোর মতো দীর্ঘ বাহু নাই। অমনি মূর্তিরা দুধারে রথের দুধারে সারি সারি দাঁড়িয়ে নাচছে আর রথখনা ধীরে ধীরে সমুদ্রে নামছে। সমুদ্রের গায়ে যেন কাঁটা দিয়ে উঠেছে। চতুর্দিকে থেকে ঝমঝম ঝমঝম মলের শব্দ উঠছে।.....

হঠাৎ ঘরের জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি মোটাযোটা জলের সুতো কোনো মাকুতে খুব দ্রুত যেন গুটিয়ে যাচ্ছে আর তাদের গায়ে রোদ পড়ে চকচক করছে। আর শব্দ উঠছে ঝমঝম ঝমঝম। চোখ রগড়ে একবার চারদিকে চেয়ে দেখি দেওয়ালে জিরো ওয়াটের আলোটা জ্বলছে। কিন্তু আলোটা কেমন যেন ভিজে গেছে। না ঘরের হাওয়াটা ভিজে গেছে। অনুভব করছি আমিও যেন ভিজে গেছি। আমার এই ঘরখানি ভিজে গেছে। ভিতরে না হোক বাইরে কেননা ভেজা গন্ধ পাচ্ছি। বাইরে প্লাসটার ছাড়া ইটগুলো চুপ করে নিশ্চল হয়ে ভিজছে হাত বের করে মুখখানাও মুছতে পারছেনা। যেমন আমি দুহাত দিয়ে নিজের চোখ মুখ মুছলাম। চোখমুখ মুছে দেখি আমর দরজায় কে প্রকান্ড একটা গঙ্গা ফড়িং পিছনের দুপায়ে ভর করে দাঁড়িয়ে দরজাটা প্রায় আটক দিয়েছে। ছোট্ট মাথাটা, বড় বড় ভাঁটার মতো বাইরে বেরিয়ে আসা দুটো চোখ। নাক ঠোঁট একাকার হয়ে উচুঁ হয়ে এগিয়ে এসেছে দুটো চোখের মাঝখান থেকে। গলাটা প্রায় একটু করে দড়ির মতো সরু। গাটা ছাই রঙের। হাত দুটো লিকলিকে। হবেই তো ফড়িং এর পা আর কতো মোটা হবে? আবার চোখ পরিস্কার করি দুহাত ঘষে। বাইরে প্রকান্ড কোনো সবুজ মাঠ বৃষ্টিতে ভিজে গেছে আর সেই প্রকান্ড সবুজ মাঠ থেকে এই সবুজ মাঠ বৃষ্টিতে ভিজে গেছে আর সেই প্রকান্ড সবুজ মাঠ থেকে এই সবুজ ছাই রঙের গঙ্গা ফড়িং লাফিয়ে লাফিয়ে এসে এখানে দাঁড়িয়েছে। পিছনের পায়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে আমার এই দরজায়। ঝিলিকের মতো মনে পড়ল একজোড়া সাদা ধবধবে শাঁখ রঙের পায়ে মল, সেই পা দুটো সবুজ একফালি ঘাসের ওপর দিয়ে আমার কাছে ছুটে এলো। মাটির সঙ্গে মলের কথা হোলো মল মলের মতো বাজল না। তবু অল্পসল্প রুনঝুন রুনঝুন করে উঠল। হারিয়ে গেল, মুহূর্তেই পা জোড়া হারিয়ে গেল। মনে হোলো আমার সেই তেঁতুল ফুলের গালিচার ওপর দিয়ে ছুটে হারিয়ে গেল।

এই যে!

চেনা লোক। ঘরে ঢুকে আমার সামনের নড়বড়ে টেবিলটার উপর ধুপ করে একতাড়া গোটানো কাগজ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললে: আর একবার প্রুফটা দেখে দেবেন। এবারই শেষ। আমাকে আর প্রুফ

দেখতে হবেনা। এবারের টাকাটাও নিয়ে এসেছি। এই নিন। থম্ থম্ থম্ তিনখানা নোট আমার কোলের ওপর ফেলে দিলে। কোনো গাছ থেকে যেন তিনটে শুকনো পাতা পড়ল কোলে।

একখানা নোট উলটে পড়েছিল। অবাক হয়ে দেখি মাঝ খানে একখানা নৌকো সদাগরী নৌকা, অনেক খানা পালতুলে চলেছে কোনো বড় নদীর মোহনা মনে হচ্ছে। দূরে জলতল দিনে মনে হয় স্থির, সামনে কূলের কাদে ঢেউ ভাঙ্গছে। ডানদিকে ওপর দেখা যায়-ওপারে পাহাড়। একবার ট্রেনে যেতে যেতে চিলকা হ্রদ দেখেছিলাম মনে হোলো যেন সেই চিলকা। এক চিলতে সমুদ্র। টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে, জলটা সমুদ্রের জলের মতো নীল হয়ে গেছে, একটা বড়ো মাছ রূপোর একখানা বাকাঁনো চাকতির মতো আকাশের দিকে লাফিয়ে আবার জলে মিলিয়ে গেল। সেই চিলকা যা পেরিয়ে আমার বিশাখাপতনম। সেখানে একটা পাহাড় ছিল কিংবা মাটির একধরনের একটা স্ফীতি ছিল। এই পাহাড়ে একটা দেবদারু গাছ ছিল। এই দেবদারুটাকে ঘিরে বৃষ্টির মতো কী একটা ঝির ঝির করে পড়ছে। সেদিন টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। সেদিন কি বাইশে জুন? হ্যাঁ, সেই একচিলতে সমুদ্রে অনেক অনেক নৌকো দেখেছিলাম। কিন্তু সে নৌকা গুলি তো জলে আর এই নৌকোটাতে কাগজের নোটের পিঠে। কিন্তু সেই নৌকোর মতো এই নৌকাও যেন চলেছে।

আপনি করেছেন কি?

মনে মনে বলি কী আমি করেছি?

আপনি করেছেন কি? লোকটা আবার ঘাস ফড়িং হয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে সামনে। এতোক্ষণ বসে ছিল।

ওর গলা দিয়ে চিঁ চি ধবনের একটা শব্দ বেরোচ্ছো: আপনি করেছেন কি?

কি করেছি? নিজেকেই জিজ্ঞাসা করি। কিন্তু যাকে জিজ্ঞাসা করি যে সাড়া দেয় না। তাই বাধ্য হয়ে চুপ করে থাকি।

জানেন এটা ইতিহাসের বই। বয়েই গেছে তাতে আমার। আমার ঠোঁট দুটো চেপে ধরে কে বলে আমার ভেতর থেকে। প্যারা জালাল উদ্দিন খলজীর সিংহাসন প্রাপ্তি তেরই জুন বারশ নব্বই, ফিরোজ তুঘলকের সুলতান পদ গ্রহণ মার্চ তেরশ একান্ন। শুনছি গঙ্গা ফড়িং যা বলেছে। আপনি পান্ডুলিপির এই তারিখগুলো কেটে দিয়ে লিখেছেন বাইশে জুন। শুনছি গঙ্গা ফড়িং আরও কী বলছে। যেখানেই সিংহাসন প্রাপ্তি আছে যুদ্ধ বিজয় আছে সেখানেই আপনি আসল তারিখ কেটে দিয়ে লিখে দিয়েছেন বাইশে জুন। সাতশ বছর ধরে এমনি সব ঘটনার তারিখ কেটে আপনি বাইশে জুন করেছেন।

বাইশে জুন, বাইশে জুন, জিপসী মেয়ের মতো ঐ তারিখটা খাগড়া ঘুরিয়ে দ্রুত পায়ে নাচতে নাচতে এখান থেকে ওখান এদেশ থেকে ওদেশ ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার পায়ে ঘুঙুরের শব্দ আমি শুনতে পাচ্ছি। তবু এ গঙ্গাফড়িংটার কথাগুলো কী এক ধরনের ঝিঁ ঝিঁ শব্দ করে টুকরো টুকরো হয়ে কানে ঢুকছে। কিংবা ঘরের ভেতর, না আমার কানের ভেতর চামচিকে ঢুকে পড়েছে।

আলাউদ্দিন মরেছে তেরশ ষোলয় আর গিয়াসুদ্দিন মরেছে তেরশ পঁচিশে কিন্তু আপনি লিখেছেন, আসল তারিখ কেটে দিয়ে, আঠারোশ সাতানব্বই। আপনি কী পাগল? বলছে, হ্যাঁ আরো কথা বলছে ঐ গঙ্গা ফড়িং। আমি শুনছি ঐ জিপসীর পায়ের ঘুঙুরের শব্দ ছাপিয়ে ওর চিংচি বা ঝিঁ ঝিঁ শব্দ শোনা যাচ্ছে।

শুধু সব মৃত্যুর নয় হাজার বছর ধরে সমস্ত জন্মের তারিখ কেটে আপনি বসিয়েছেন আঠারোশ সাতানব্বই, কোথাও কোথাও ঊনিশে আগষ্ট তারিখটাও জুড়িয়ে দিয়েছেন। কী ভেবেছেন আপনি? ফড়িংটা কামড়ে দেবে নাকি? চাকিতে মনে হোলো না ও মানুষ ও কামড়াবে না। ফড়িং ওর ডাক নাম। আসলে ও মানুষ।

সহসা দেখি কোলের ওপর উপুড় হয়ে পড়া নোটের নৌকো খানা চলতে শুরু করেছে। আর আশ্চর্য্য,এই সদাগরী নৌকায় মালের বদলে রয়েছে আঠারোশ সাতানব্বই। ঐ নৌকাটা আঠারোশ সাতানব্বই কে বয়ে নিয়ে চলেছে। এরপর চিলকা পেরিয়ে সমুদ্রে পড়বে, তারপর কতো দেশের কতো কতো বন্দরে।

হাহাহাহা বিকট একটা শব্দ। এই ঘরখানা একটা মুখ হায় গেল নাকি? সেই মুখ থেকে কি ঐ হাহাহাহা বিকট হাসিটা বেরিয়ে এল? হুড়মুড় শব্দে হোলে। ওকি! এই শব্দের ধাক্কায় চেয়ার টেবিল উলটে গেল কি? আমার দিনরাত জেলে রাখা আলোটা নিভে গেল নাকি? দরজার দিকে চেয়ে দেখি ফড়িংটা বাইরে দাঁড়িয়ে কাঁপছে, ওর ডানা দুটো ছড়িয়ে দিয়ে কাপছে বড়বড় বেরিয়ে আসা চোখ দুটো যেন ঝুলে পড়েছে মাথা থেকে এবং একটা বাঁকাচোরা মুখ। এক টুকরো চেনা মাটির মতো। এক চিলতে চেনা জায়গার মতো।